আমাদের বাদশাহ নামদার হুমায়ুন আহমেদ

ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান

অকালেই চলে গেলেন হুমায়ুন আহমেদ। দেশের সব স্তরের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হলেও সব চেয়ে নন্দিত ছিলেন মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর কাছে। ছিলেন মধ্যবিত্তের অন্যতম প্রতিনিধি। আমাদের একটি বিখ্যাত সামাজিক বচন- উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে, তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে। মধ্যবিত্তের এই তফাতে চলা কথাটা এক ধরণের বক্রোক্তি হলেও, বাস্তব সত্য হচ্ছে মধ্যবিত্তের তফাতে চলা ছাড়া উপায় নেই। কারণ মধ্যবিত্তকে হিসাব করে চলতে হয়। সেই হিসেবে সামান্যতম ভুল হবার জো নেই, ভুল মানেই পথের শেষ। মধ্যবিত্তের অন্যতম প্রতিনিধি হুমায়ুন আহমেদের চলে যাওয়ার আগে অকাল শব্দটি তাই হিসাব করেই বসাতে হয়েছে। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের মানুষের গড় আয়ু ৬৬ দশমিক ৮ বছর। অথচ হুমায়ুন আহমেদ মারা গেলেন ৬৪ বছর বয়সে। প্রিয় লেখককে হারানোর বেদনার পাশাপাশি দেশের মধ্যবিত্তের এই হিসাব না মেলার একটা সংকট কিন্তু থেকেই গেল।

সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আরো একটি বিশেষ পেশার মানুষও হয়তো হিসাব না মেলার এই চিত্রটি পুনরায় পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেন। এরা চিকিৎসক। সব রকম চিকিৎসা চালানোর পরেও রোগী যখন মৃত্যু বরণ করে তখন ক্লিনিক্যাল অটোপসীর মাধ্যমে শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে পরীক্ষা করা হয়। প্রতিটি অঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। রোগীর চিকিৎসার দায়িত্বে ফিজিশিয়ান বা সার্জন থাকলেও অটোপসী করেন প্যাথলজিস্ট। পরবর্তীতে সব বিভাগের চিকিৎসক মিলে কনফারেন্স ডেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রোগীর চিকিৎসার পুণর্মূল্যায়ন করা হয়, অর্থাৎ আর একবার হিসাব কষা হয়। মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছি, হুমায়ুন আহমদের অসুখ, অকাল প্রয়াণ এর কথা, মৃত্যুর পর তাঁর অটোপসি করানো হয়েছে, তাও জানলাম। তবে সেই অটোপসির বিবরণ জানা যায় নি। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ ব্যাপারটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক, সাধারণের জানার কথা নয়। তবে হুমায়ুন আহমেদের একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে ও একজন মধ্যবিত্ত হিসেবে, সেই সাথে একজন প্যাথলজিস্ট হিসেবে কয়েক শত ক্লিনিক্যাল অটোপসি করার অভিজ্ঞতার আলোকেও এই হিসাব না মেলাটা আমাকে ভাবাচ্ছে, ভোগাচ্ছে।

তাই শুরুতেই আমার করা একটি অটোপসির অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরতে চাই এজন্য যে, কেসটির সাথে হুমায়ুন আহমেদের অসুখ ও তার পরিণতির যথেষ্ট মিল রয়েছে। রোগী জাপানী, বয়স ষাটের কোঠায়। জাপানীদের গড় আয়ু ৮২ দশমিক ৭ বছর, সেই হিসাবে বলা যায় তরুণ। একটি প্রাইভেট কোম্পানির মালিক। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে গিয়ে কাকতালীয় ভাবে ধরা পড়ে বৃহদান্ত্রের ক্যান্সার। কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। কিছুদিন বিরতির পর সার্জন তার অপেরাশন করেন। অপারেশনের এক সপ্তাহ পর তিনি বাড়ী ফিরে যান। তিনদিন পরে পেটে ব্যথা অনুভূত হওয়াতে আবারো হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। পরীক্ষায় ধরা পড়ে অপারেশনে বৃহদান্ত্রের জোড়া দেওয়া স্থানে ইনফেকশন ও লিক। দ্বিতীয়বার অপারেশন করা হয়, দেওয়া হয় হেভি ডোজ এ কড়া এন্টিবায়োটিক। তবে, ইনফেকশন কন্ট্রোল করা যায় নি। এক পর্যায়ে ফুসফুসে পানি জমে শ্বাস কষ্ট শুরু হলে সংযোজন করা হয় কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র। চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও রোগীর অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটে ও মৃত্যু হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত প্যাথলজিষ্ট হিসাবে রোগীর অটোপসি করতে আমাকে। অটোপসির সময় আমার কাছে সার্জনের প্রশ্ন ছিল, ইনফেকশন টা ভাইরাস এর কারণে ঘটেছিল না কি ব্যাকটেরিয়ার কারণে? ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন হলে রক্ত পরীক্ষার ফলাফলে, শ্বেত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি সহ আরো কিছু পরিবর্তন ধরা পড়ার কথা অথচ সে রকম কিছু ধরা পড়ে নি। আবার নির্দিষ্ট কোন ভাইরাল মার্কার ও পাওয়া যায় নিরীক্ষায়। ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়েছিলে পেটে, তা হলে হঠাৎ করে ফুসফুসে পানি জমা ও শ্বাস কষ্টের কারণ কি?

অটোপসি শেষে রিপোর্ট তৈরি করলাম, কিছুদিন পর যথারীতি শুরু হলো সার্জন ও অন্যান্য বিভাগের চিকিৎসক ও প্যাথলজিস্টদের নিয় যৌথ ক্লিনিকো-প্যাথলজিক্যাল কনফারেন্স। বিভিন্ন সময়ে রোগীর দায়িত্ব থাকা চিকিৎসকদের বক্তব্য থেকে জানা গেল, চিকিৎসকের অধিকাংশ নির্দেশই যথাযথ পালন করেছিলেন রোগী। তবে দুএকটা ক্ষেত্রে কিছু গাফিলতিও ছিল, কারণ নিজের প্রাইভেট কোম্পানিতে ব্যবসায়িক মন্দার কারণে ভীষণ মানসিক চাপে ছিলেন। তার উপর, দীর্ঘ কেমোথেরাপির ফলে ছিলেন ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত। ব্যবসায় দেউলিয়া হলে অপারেশন করে সুস্থ হয়ে উঠেই বা কি লাভ, এমন কথাও বলেছিলেন। একটা বড় ধরণের অসুখ মোকাবিলা করার জন্য যে আত্মবিশ্বাস থাকার প্রয়োজন তার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল রোগীর মধ্যে। একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উল্লেখ করলেন, ক্লান্তি দেহের রোগ প্রতিরোধকারী ইমিউন সিস্টেম এর উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে, দুর্বল করে দিতে পারে রোগীকে।

অটোপসি রিপোর্টে আমি যা উল্লেখ করেছিলাম তার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে ব্যাখ্যা সহ তুলে দিচ্ছি।

১) মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষায় অনুযায়ী, রোগীর অপারেশনের স্থানে ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন ছিল ও বৃহদান্ত্রের জোড়া দেওয়া স্থানে লিক সৃষ্টি হওয়ায়, সেই ইনফেকশন উদর পর্দার প্রদাহের (পেরিটোনাইটিস) মাধ্যমে সারা পেটেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

২) রোগীর অস্থি-মজ্জা (বোন ম্যারো) ছিল প্রায় কোষ শূন্য ও লিভার ছিল অকার্যকর। দেহে কোথাও ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন হলে তা প্রথমে প্রতিহত করে রক্তে সঞ্চালিত শ্বেত কণিকা। এই শ্বেত কণিকা প্রাথমিক অবস্থায় থাকে অস্থি –মজ্জায় এবং ইনফেকশনের সংকেত পেলে বিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করে অস্থি মজ্জা থেকে বেরিয়ে রক্ত সঞ্চালনে প্রবেশ করে ও ইনফেকশনের স্থানে পৌঁছে যায়। অস্থি-মজ্জা কোষ শূন্য হয়ে পড়লে ইনফেকশনের সংকেত পাওয়া সত্ত্বেও শ্বেত কণিকার সংখ্যাবৃদ্ধি করার উপায় থাকে না। ফলে সঞ্চালিত রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পরীক্ষায় ধরা পড়ে না, অথচ ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন এ এটি ধরা পড়ার কথা। দেহে ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন হলে, আর এক উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন সহ নির্দিষ্ট কিছু প্রোটিন এর পরিমাণ বৃদ্ধি। এই প্রোটিনগুলি তৈরি হয় লিভার এ। তবে লিভার অকার্যকর হয়ে পড়লে এ সব প্রোটিন এর পরিমাণ বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে ইনফেকশনের বিষয়টি সঠিক ভাবে প্রতিফলিত হয় না। উপরন্তু, হেভি ডোজ এ কড়া এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে, এমনকি ব্লাড কালচারের মাধ্যমেও ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৩) পেটে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে, এক পর্যায়ে তা সেপ্টিসেমিয়া অর্থাৎ রক্তের সংক্রমণে রূপান্তরিত হয়। অবস্থার অবনতি ঘটলে, রোগী শক এ চলে যায়, সংজ্ঞা হারায়। স্বাভাবিক অবস্থায় দেহের রক্তনালীগুলি সামান্য সংকুচিত ও শক্ত থাকলেও সেপ্টিসেমিয়া জনিত শক ঘটলে রক্তনালীগুলি প্রসারিত ও শিথিল হয়ে পড়ে ও রক্তের জলীয় অংশ রক্তনালী থেকে চুইয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে। বিশেষ করে ফুসফুসের এ্যালাভিওলার স্যাক অর্থাৎ বাতাস থাকার ছোট ছোট বায়ু প্রকোষ্ঠ গুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও রক্তনালী থেকে চুইয়ে বেরিয়ে আসা (প্রোটিন সমৃদ্ধ) জলীয় অংশ বায়ু প্রকোষ্ঠগুলিতে জমা হতে থাকে (প্যাথলজির ভাষায় যাকে বলা হয় ডিফিউজ এ্যালভিওলার ড্যামেজ)। এ ধরণের অস্বাভাবিক পরিবর্তন প্রধানত ফুসফুসের কিছু অসুখ কিংবা ভাইরাস ইনফেকশনে দেখা গেলেও, সেপ্টিসেমিয়া জনিত শক এর ক্ষেত্রেও তা দেখা দিতে পারে। ফুসফুসে পানি জমে যাওয়ার ফলে, রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটি একটি প্রান্তিক অবস্থা। অনেকে এ অবস্থা থেকেও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন আবার অনেকের মৃত্যু ঘটে। ফলাফল কি হবে, তা নির্ভর করে রোগীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহ্য করা ও প্রতিরোধ করার ক্ষমতার উপর, যা প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র এবং তার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন অনেক সময় অসম্ভব।

একজন ক্যান্সারের রোগীকে যখন কেমোথেরাপি দেওয়া হয় সেই শক্তিশালী ঔষধ কেবল মাত্র ক্যান্সার কোষগুলিকেই ধ্বংস করে না। সেই সাথে অস্থি-মজ্জার অনেক কোষ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ফলে কমে যায় রোগীর ইনফেকশন প্রতিরোধ করার স্বভাবজাত ক্ষমতা। কেমোথেরাপির শক্তিশালী ঔষধ নির্বিষ করে শরীর থেকে মূত্র বা মলের মাধ্যমে বের করে দেওয়ার কাজটি করে লিভার। কেমোথেরাপির কারণে লিভার এর সাধারণ কার্যক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেমোথেরাপির রোগীকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়, অস্থি-মজ্জা, লিভার, কিডনি সহ সকল অঙ্গের কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। মানব দেহযন্ত্র তো গাড়ীর ইঞ্জিনের মতোই। গাড়ী স্টার্ট দিয়ে ফুল স্পীডে যাওয়া পর্যন্ত কিছুটা সময় লাগে। ইঞ্জিনের যদি টার্বো ক্ষমতা থাকে তাহলে খুব অল্প সময়ে গাড়ী ফুল স্পীডে চলে যেতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানব দেহযন্ত্রের জন্যও এই টার্বো ক্ষমতার প্রয়োজন পড়ে। যেমন ইনফেকশন। দেহকে এর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয় দ্রুত স্পীডে। আর সেই দ্রুত স্পীড তোলার ক্ষমতা নির্ভর করে দেহের রিজার্ভ এর উপর। কেমোথেরাপি এই রিজার্ভটাকে ধীরে ধীরে নিঃস্ব করে দেয়। হুমায়ুন আহমেদ এর ক্ষেত্রে ঠিক কি হয়েছিল জানি না, তবে মানব দেহ ব্যবচ্ছেদের এই অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরার কারণ, ক্যান্সারের চিকিৎসায় কেমোথেরাপি ও তার জটিলতা সম্পর্কে পাঠক সমাজকে একটা ধারণা দেওয়া।

হুমায়ুন আহমেদ ছিলেন একজন সুস্থ মানুষ, সবল তো বটেই। ধূমপান করতেন, অনিয়ম করতেন, তবে শারীরিক সমস্যা বলতে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু শোনা যায় নি। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রথম ধাক্কাটা খান বুকে, ২০০৪ সালে, হার্ট এ্যাটাকের জন্য তাকে সিঙ্গাপুর গিয়ে বাইপাস সার্জারি করাতে হয়। এর পরেও অনিয়ম চলছিল, তবে ভিতরে ভিতরে সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন বোঝা যায়। কারণ, ২০১১ সালে মাকে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাবার সময় সেখানে নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে

নিতে তিনি ভোলেন নি, যে সূত্রে কাকতালীয় ভাবে ধরা পড়ে তাঁর বৃহদান্ত্রের ক্যান্সার। এর পর অবশ্য হিসাবে কোন ভুল করেন নি। ১৪ সেপ্টেম্বর সোজা চলে যান বিশ্বের সেরা ক্যান্সার সেন্টার হিসাবে সুবিদিত, নিউ ইয়র্ক এর মেমোরিয়াল স্লোয়ান-কেটরিং সেন্টারে। সেখান সারা দেহ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে, তাঁর জন্য সব চেয়ে উপযোগী চিকিৎসার কোর্সটি নির্ধারণ করা হয়। শুরু হয় বারোটি কেমোথেরাপি। কোনরকম জটিলতা ছাড়া শেষ হয় কেমোথেরাপি, অপারেশন এর আগে সপরিবারে দেশে আসেন ১১ মে। দেশে এসে ঢাকা নগরীর কোলাহল এড়িয়ে সোজা চলে যান নুহাশ পল্লীতে, পূর্ণ বিশ্রামে। এ পর্যন্ত এসে একটি কথা মনে জাগে। এই বিশ্রাম তো তিনি নিউ ইয়র্কেই নিতে পারতেন, সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নুহাশ পল্লীতে কেন আসা। অনুভব করি তিনি কতটা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ধকলটা কি শুধু কেমোথারাপীর ছিল নাকি অন্যকিছুও ছিল?

একজন কেমোথেরাপির রোগীকে ডাক্তার পই পই করে যে পরামর্শটা দেন তা হলো- ‘সাবধানে থেকো, যতদূর সম্ভব লোকজন থেকে দূরে থেকো, প্রয়োজনে মাস্ক ব্যবহার করো, ইনফেকশন বাধিয়ো না’। পরামর্শ শুধু রোগী নয়, তার পরিবার বিশেষ করে স্ত্রী সাথে থাকলে স্ত্রীকেও বারবার দেওয়া হয়। হুমায়ুন আহমেদকেও নিশ্চয়ই এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা মেনে চলা তাঁর পক্ষে হয়ত ততোটা সম্ভব হয় নি। সঙ্গ প্রিয়, হৃদয়বান মানুষ হুমায়ুন আহমেদ। ভক্তদের এড়িয়ে চলবেন, দর্শনার্থীদের দেখা দেবেন না, তা কি হয়! স্ত্রীর বারণ ও তিনি শোনেন নি নিশ্চয়। তার স্ত্রী যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছেন তা বোঝা যায়, শেষ দিকে এসে, অপারেশনের পর যে করে হোক বাসা বদলের প্রচেষ্টা। সেটা ছিল প্রিয়তম স্বামীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে একটু দম নেবার সুযোগ করে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা। ভাল ছাত্র ছিলেন হুমায়ুন। জানতেন, পরীক্ষায় ভাল করতে হলে প্রস্তুতি নিতে হয়। জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা, ভাল রেজাল্ট করতেই হবে, সেজন্যেই তো সুদূর নিউ ইয়র্কে পরবাসে যাওয়া। প্রতিক্ষণে তা উপলব্ধি করতে পারলেও পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে ঠিকমতো প্রস্তুতি তিনি নিতে পারেন নি। কবি শামছুর রাহমানের ভাষায়- তাঁর সমস্ত সময়, সব জীবনী শক্তি, সুমিষ্ট পিঠার মতো ভাগ করে খেয়েছে সবাই! সদা হাস্যময় হুমায়ুনকে দেখে কেউ বুঝতে পারেন নি একটু বিশ্রাম তার কতোটা প্রয়োজন ছিল, জরুরী ছিল।

অবশেষে নুহাশ পল্লীতে ফিরে একটু বিশ্রাম হয়তো পেয়েছিলেন। হয়তো বলছি এ জন্যে যে সে সময়, প্রতিদিনের সংবাদে দেখেছি তাঁকে, দেখা গেছে টিভির পর্দায়। একুশ দিন দেশে থাকার পর তার ফিরে যাবার দৃশ্যে কিছুটা সচকিত হই। ৩ জুন শনিবার নিনাদকে কোলে নিয়ে, বাংলাদেশ থেকে রওনা হয়ে প্রায় দীর্ঘ যাত্রাবিরতি। দিল্লিতে আর ব্রাসেলসে আড়াই ঘণ্টা কাটিয়ে অবশেষে ৪ জুন নিউ ইয়র্ক পৌঁছানোর সময় দুপুর সাড়ে ১২টা। নির্ধারিত সময়ে প্লেন অবতরণ করে কিন্তু লাগেজ না আসায় বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে হয় আরো কিছু সময়। সুদীর্ঘ যাত্রা, এ যাত্রার ক্লান্তি কাটতে সময় লাগার কথা। তবে এর আট দিন পর, ১২ জুন তাঁর শারীরিক অবস্থা মূল্যায়ন করেই, বেলভ্যু হাসপাতালে অপারেশন। অপারেশনের সাতদিন পর, ১৯ জুন হাসপাতাল থেকে বাসায় ফেরা। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, চিকিৎসকরা তাকে একটু আগেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে সেটা অবহেলা নয়, উদ্বেগে। হাসপাতালেও তার দর্শনার্থী ছিল প্রচুর, এটা পত্রিকার পাতা থেকেই জেনেছি। তা এত বেশী ছিল যে

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একবার নাকি পুলিশ ডাকার কথাও ভেবেছিল। আমার মনে হয় বাসা পরিবর্তনের পরামর্শ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে থাকতে পারে, যাতে রোগী একটু নিরিবিলিতে বিশ্রাম পায়। নিরিবিলিতে থাকার সে সুযোগ কি হুমায়ুন কখনো পেয়েছিলেন? বাসায় ফেরার দুইদিন পর পেটে ব্যথা অনুভব করেন তিনি, অবস্থার অবনতি ঘটলে আবার হাসপাতালে নেওয়া হয়। ২১ জুন হয় দ্বিতীয় অস্ত্রোপচার।

এই দ্বিতীয় অস্ত্রোপচার এর আগে, ক্যান্সার সার্জন জজ মিলার এর সাথে হুমায়ুন আহমেদ এর কিছু কথোপকথনে চমকিত হই। আমি কি মারা যাবো এই প্রশ্নের উত্তরে সার্জন মিলার বলেছেন, আপনি আশ্বস্ত হতে পারেন অস্ত্রোপচারের কারণে আপনার মৃত্যু হবে না। সেরকম কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কেন হুমায়ুনের এই প্রশ্ন? তাঁর হিসাব আর ডাক্তার মিলারের হিসাবে কি কোন ব্যবধান ছিল? কিছু দিন আগে, বাদশাহ নামদার বইয়ের উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন,'আমার কেবলই মনে হচ্ছে পুত্র নিনিত পিতার কোনো স্মৃতি না নিয়েই বড় হবে'। তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন, উত্তীর্ণ হবার জন্য যে প্রস্তুতি ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে অপারেশন নামক কঠিন পরীক্ষাটি তার দেওয়া দরকার ছিল, সেখানে ঘাটতি রয়েছে। পরবর্তীতে তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত এটাই কি প্রতিভাত হয় না যে ডাক্তারের নয় তাঁর নিজের হিসাবটাই সঠিক ছিল!

ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো আফসোস নেই’। নিজের মৃত্যু সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তুতি না থাকলে একজন মানুষ এভাবে বলে না। ২০০৪ সালে হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি যাওয়ার সময় কিন্তু তার আফসোস ছিল- জোছনা ও জননীর গল্প না লিখে যেতে পারার আফসোস। তখনকার কথা তিনি এভাবে বলেছেন, ‘আমাকে যদি আরেকবার পৃথিবীতে ফিরে আসার সুযোগ দেওয়া হয়- আমি এই লেখাটি অবশ্যই শেষ করব’। সেই গল্প তিনি শেষ করেছিলেন, তা প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৪ এ।

এর পরেই সম্ভবত নিজের জীবন নাটকটি তৈরির তাগাদা অনুভব করেন হুমায়ুন। তিলে তিলে তিলোত্তমা করে গড়ে তোলেন নুহাশ পল্লী। গুলতেকিন আহমেদ কে ছেড়ে জীবন সঙ্গী হিসেবে বেছে নেন মেহের আফরোজ শাওনকে। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি-চরিত্র পর্যবেক্ষণ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল হুমায়ুন আহমেদের। গুলতেকিন কে ছেড়ে না দিয়েও শাওনের সাথে একটা সমান্তরাল সম্পর্ক কি তিনি রাখতে পারতেন না? তা না করে আনুষ্ঠানিক ভাবে কেবল শাওনকে কেন বেছে নিলেন? তাৎক্ষনিক সেটা না বোঝা গেলেও, ক্যান্সারের সাথে দশ মাসের যুদ্ধ, পরবর্তীতে নুহাশ পল্লীতে মরদেহ সমাহিত করার ব্যাপারে শাওনের বিন্দুমাত্র ছাড় না দেওয়া দেখে তা বোঝা যায়। শুধু সহধর্মীনি নয়, জীবন সঙ্গিনী হিসেবে বিশ্বস্ত ও নির্ভীক এক সহযোদ্ধার প্রয়োজন ছিল তার। সেই সহযোদ্ধা তাঁর অবর্তমানে, তাঁর জীবন নাটকের শেষ দৃশ্যটিও যেন নিখুঁত ভাবে বাস্তবায়িত করতে পারে। নুহাশ পল্লীতে সমাহিত হবার সেই নিখুঁত দৃশ্যটি আমরা টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছি।

বরাবর নুহাশ পল্লীতে সমাহিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেও জীবনের শেষ সময়ে এসে হঠাৎ তিনি

অন্য কথা বলেছিলেন। 'আমি চাচ্ছিলাম আমার মৃত্যুটা, আমার কবরটা এখানে (নুহাশ পল্লীতে) হোক। পরে দেখলাম এটা কবরস্থান হয়ে যাবে। এখানে থাকলে দুনিয়ার লোক আসবে একুশে ফেব্রুয়ারিতে ফুল দেওয়ার জন্য, তেরোই নভেম্বরে ফুল দেওয়ার জন্য'। তাঁর সংশয় ছিল, কবর পূজার অজুহাতে আজীবন নন্দিত হুমায়ুন, মৃত্যুর পর নিন্দিত হুমায়ুনে যেন পরিণত না হয়। তবে অন্তিম মূহুর্তে সেই দোদুল্যমানতা কেটে গেছে। বিশ্রামের জন্য বারবার নুহাশ পল্লীতে ফেরা হুমায়ুন তার অন্তিম বিশ্রামের স্থানটির কথা শাওনকে বলে গেছেন, 'আমার যদি কিছু হয় আমাকে নিয়ে ওরা অনেক টান হেঁচড়া করবে, তুমি শক্ত থেক কুসুম। আমাকে নুহাশ পল্লীতে নিয়ে যেও'। নিশ্চিত জানতেন, নন্দিত হুমায়ুনের জন্য নিন্দিত হতে হলেও এক পা পিছু হটবেন না এই সহযোদ্ধা।

নিন্দিত হবার ঝুঁকি কিন্তু গুলতেকিন আহমেদ এর মেয়েরা নিতে চান নি। হুমায়ুনের মরদেহ সমাহিত করার ব্যাপারে শাওনের অনড় অবস্থানের উল্টোদিকে, গুলতেকিন এর মেয়েদের নিন্দিত হবার ভয়টি তাদের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে,'দেশের মানুষও যেন মনে না করতে পারে যে আমরা তাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছি'। এই যে অনেকে নিজের চশমায় শাওনকে দেখে তাঁর সমালোচনা করছেন, তাতে হুমায়ুনের আত্মা কি শান্তি পাচ্ছে? আমরা তো তাঁর জীবনের এম্পিথিয়েটারে বসা দর্শক মাত্র। নিজের চশমা খুলে যদি হুমায়ুনের চশমায় একবার শাওনের দিকে তাকাই, তা হলে হয়তো দেখতে পাবো এক নির্ভীক গ্ল্যাডিয়েটরকে, যে হারে নি, হারবে না। হুমায়ুন আহমেদই কি সে জন্যে গুলতেকিনকে ছেড়ে শাওন কে বেছে নেন নি? ভালবাসার কাছে হার মেনে, হুমায়ুনের সন্তানেরা দেখতে গেছেন অসুস্থ পিতাকে, মৃত্যুর পর আছড়ে পড়েছেন কফিনের উপর। ক্যান্সারের সাথে মুক্তিযুদ্ধের সমান বয়সী এক যুদ্ধ, অচেনা মাটিতে ধুকে-ভুগে অচিন পুরে যাত্রা, তবু গুলতেকিন শেষ বিদায় জানাতে যান নি। এতেও যদি হুমায়ুনের এক জীবনের পাপ মোচন না হয়, সে জন্য সহ যোদ্ধা শাওনকে ক্রুশ-বিদ্ধ করে পাপ মোচনের প্রচেষ্টা অন্যায্য।

জয় পরাজয়ের হিসাব নিয়ে হুমায়ুন নিজেও ভুগেছেন। মধ্যবিত্তের জীবনে সেটাই তো সবচেয়ে বড় দুর্ভোগ! জীবন সায়াহ্নে এসে লিখলেন 'বাদশাহ নামদার'। বইটির পটভূমি থেকে জানা যায় সম্রাট হুমায়ুনের ক্রমাগত পরাজয়ের দায়ভার তাঁকেও বইতে হয়েছে, স্কুলের বন্ধুরা তাঁকে 'হারু হুমায়ুন' বলে ডাকতো। হয়তো দুশ্চিন্তা ছিলো, কালের মূল্যায়নে আবারো না হারু হুমায়ুন হতে হয়! কিন্তু তার অসুস্থতায়, তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর অনুষ্ঠানে, জানাজা ও দাফনে মানুষের যে বিশাল ঢল, টেলিভিশনের পর্দায় তা দেখে একটা কথাই মনে হয়েছে। এ তো দিল্লির সম্রাট 'হারু হুমায়ুন' নয়। এ আমাদের বাদশাহ নামদার, হিরো হুমায়ুন। জীবদ্দশায় কলকাতা মুখী প্রকাশনা অর্থনীতির স্রোত তিনি যে ভাবে ঢাকার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, জীবনাবসানে একজন হুমায়ুনকে চিনতে আমাদের দৃষ্টি তিনি দিল্লি থেকে ঢাকার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। আমাদের বাদশাহ নামদার হুমায়ুন ঘুমিয়ে আছেন ঢাকায়, নুহাশ পল্লীতে। দিল্লীতে সম্রাট হুমায়ুনের কবর ঘিরে যেমন সৌধ তৈরি হয়েছে আমাদের বাদশাহ নামদারের স্মৃতিতে তেমন সৌধ নির্মিত হতেই পারে। নুহাশ পল্লীর প্রবেশ পথে তৈরি হতে পারে হুমায়ুন তোরণ। একুশ থেকে একাত্তর, আমাদের স্মৃতি সৌধ আছে, বিজয় স্তম্ভ তো নেই। কবর পূজা বিহীন বাংলাদেশ, ভাবা যায়! যদি ভাবতেই হয়, আমাদের নতুন কারো জন্য অপেক্ষা করতে

হবে। নুহাশ পল্লীর হুমায়ুনের উপর সেই দায়ভার আমরা চাপিয়ে দিতে পারি না।

হুমায়ুন আহমেদের মৃত্যুতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিডিয়া তাঁকে 'নন্দিত কথা সাহিত্যিক' বিশেষণে ভূষিত করেছে। কিন্তু তাঁকে শেষ ভালবাসা জানাতে আসা ঐ যে মানুষের ঢল, তাদের অধিকাংশ তাঁর পাঠক তো নয়, দর্শক। তাঁর মহাপ্রয়াণে এই যে শোকের মাতম, মিডিয়া হাইপ, তা দেখে কি আমেরিকার সেরা আইডল মাইকেল জ্যাকসন এর শেষ বিদায়ের কথা মনে পড়ে না? আকাশ সংস্কৃতির বদৌলতে, বাংলাদেশেও যে একটি ব্যাপক আইডল কালচার গড়ে উঠেছে তা কিন্তু আমরা হুমায়ুন আহমেদের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করলাম। এই একুশ শতকে বাংলাদেশের সেরা আইডল, কিং হুমায়ুন! তবে মাইকেল জ্যাকসনের মৃত্যু নিয়ে আমেরিকায় যে গুজব ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল, আমরা চাই না হুমায়ুনে আহমেদের ক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি ঘটুক। বিশেষ করে আমেরিকার প্রবাসী মহল সহ দেশের মিডিয়াগুলি এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করলে হুমায়ুনের আত্মা শান্তিতে থাকবে। সেই কামনা করেই সমাপ্তি টানছি- জীবনের চেয়ে বড় হুমায়ুন আহমেদ, জীবনের পরপারে আপনি শান্তিতে ঘুমান। নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে।

(ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান, টোকিও প্রবাসী চিকিৎসক, সংগঠক ও লেখক)